



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 542 - 547

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর সাহিত্য : বিষয় বৈচিত্র্য ও নির্মাণশৈলী

অমিত ঘোষ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: amitrgu73@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Narrative,
Implemented,
Irony, Reality,
Imagery,
Perception,
Fearless, Child
Literature.

Abstract

Legendary writer in the Bengali Literary world Sandipan Chattopadhyay. His name is well known in the literary world as a strong, fearless writer. He has roamed the literary world with his work such as short stories, novels, diaries and child literature also. In most cases, the selected stories of Sandipan Chattopadhyay has presented the story in a common style, attracting the attention of the readers and listeners. The explanation and analysis of how and to what extent these two aspects of the narrative, the narration and the point of view have been implemented in this different writing style of the author is given below with a sense of reality, the author has tried to highlight the specific political situation in the content of children's literature with the help of connections. The fearless attempt to highlight reality in the guise of irony is the story of 'the mouse and the cat'. Sandipan Chattopadhyay's writing is unique, inflexible; therefore, there is no tendency to adapt. And therefore, in the format of similes and imagery, he has achieved a wonderful expression of human perception through the children's fairy tales.

Discussion

ভাবনাকে ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমেই সাহিত্য গড়ে ওঠে। লিখিত রূপের পূর্বে সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল মৌখিক রূপেই। বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রামীণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত ছড়া, মেয়েলী ছড়া-গানে ও রূপকথা-উপকথা; গল্পগাথায় বাংলা শিশু সাহিত্যের উন্মেষ ঘটে। সৃষ্টিগত থেকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ ক্রমাগত সামাজিক বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছে। এইভাবে গল্প-রূপকথার বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—

“মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। ... পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আজ অবলুপ্ত। এই সময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে, শহর গড়ে তুলেছে, সভ্যতার মধ্যে পদক্ষেপ করছে। এ আর তার আত্মরক্ষার যুগ নয়— এ হল তার আত্মবিস্তারের পর্যায়।”

রূপকথার এই সময় পর্বের কথা থেকেই মানুষের জয় ও উল্লাসের সংকেত বহন করে। দুর্লভের অভিযানে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। সভ্যতার পথে মানুষের আকাঙ্ক্ষা তার স্বপ্নের সর্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি তাই ঘটেছে রূপকথায়। আর এই রূপকথার ধারা আজও বয়ে চলেছে - কিন্তু এখন তার স্থান কেবল শিশু জগতে সীমাবদ্ধ। তবু সকল প্রকার শিশু সাহিত্য কাহিনীর অন্তরালে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের গভীর তত্ত্বটিকে তুলে ধরে। তাইতো রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়—

“ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মৃঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ হল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা।”^২

শিশুর মন স্বভাবতই সরল, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ। তার মনের সুকুমার অনুভূতি, আবেগপ্রবণতা এবং সারল্য শাস্ত্র ভাবালুতা, কৌতূহল পরায়ণতা শিশুর স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য শিশুর এই স্বভাব বৈশিষ্ট্যই তাকে স্বতন্ত্র রূপে চিহ্নিত করে। শিশু-কিশোর সাহিত্য সেই স্বপ্ন দেখা মনের সাথী। অতএব শিশু-কিশোর সাহিত্য সেই স্বপ্ন দেখা মনের সাথী। অতএব শিশু-কিশোর মনের উপযোগী ভাববস্তু যখন সাহিত্যের আধারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে সাহিত্যধারাও বিষয়ের বৈচিত্র্যে, প্রকরণের ভিন্নতায় সাহিত্যের মূল ধারা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত রেবেকা লুকেন্স তাঁর ‘Critical Handbook of Childrens Literature about readers’ গ্রন্থে বলেছিলেন—

“We choose literature that promises entertainment and sometimes, escape ... our first motive for reading a novel or a poem is personal pleasure.”^৩

সাহিত্য আমাদের চিন্তকে বন্ধনমুক্ত করে, আনন্দ দান করে। শিশু-কিশোররাও কোনো গল্প পাঠ করে বা শোনার মধ্য দিয়ে নির্মল আনন্দ লাভ করে। এই শ্রেণীর একটি গল্প ‘বিনচ্যাকচুকুচুকু’। গল্পটি শুরু হচ্ছে সেই পূর্বকার মানুষের মতোই গল্প বলার মধ্য দিয়ে। গল্পের নামটি আসলে একটি খেলার নাম দিয়ে। গল্পকথককে এখানে গেছোদাদা বলা হয়েছে। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের কিছু কথার প্রসঙ্গে কোন একখানি গল্প শোনাবেন বলেন। আর কৌতূহলবশত ছোটরা তা শুনতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, আর বলে—

“না না। বলুন আপনি খেলাটা। প্লিজ গেছোদাদা। বিনচ্যাক— কী বললেন? চুকুচুক বললেন। বিনচ্যাকচুকুচুকু।”^৪

কিন্তু গল্পকথক তখন বলতে রাজী হয় না। তিনি বলেন এখনি গল্প বলতে শুরু করলে, তারা বইপত্র ফেলে এখনি খেলাটা খেলতে শুরু করে দেবে। কথক বলতে শুরু করেন প্রায় ৩৭ বছর আগে তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন দুমকার কাছে বেনাগড়িয়ায়। সেখানে মুঙ্গেরিলালের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বুকুন, জ্যোতিস্মিতা, সাগর ও পারিজাতদের উদ্দেশ্যে লেখক বলেন মুঙ্গেরিলালও তাদের মতো বয়সী একজন বাচ্চা। ওর বাবা নেই, মা সুশীলা বেসরা বেনাগড়িয়া মিশন চার্চ হাসপাতালের নার্স। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ওই ছেলেটি গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে গড়ে নিয়েছে গাছপালা, নদী, ঝর্ণা, পুকুর, আকাশ-বাতাস সবই তার খেলার সঙ্গী হয়েছে। সেই মুঙ্গেরিলালের কাছেই লেখক খোলামকুচি দিয়ে ব্যাঙাচি খেলা শিখেছিলেন। এক-টুকরো একটা খোলামকুচি ছুঁড়ে সে পুকুরের এপার থেকে ওপার পাঠাতে পারত। জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেটা যখন ওপারের দিকে যেত, ঠিক যেন একটা ব্যাঙাচির মতো লাগতো। কিন্তু লেখক কোনওবারেই বহুচেষ্টা করেও দশ-বারো হাতের বেশি দূর পাঠাতে পারেননি।

আর একটি খেলার কথা গল্পে উল্লেখ করেছেন গল্পকথক। অবশ্য সে খেলার নাম বা প্রসঙ্গ বলাই বাহুল্য। কেননা নাগরিক সমাজে বেড়ে ওঠা বুকুন, জ্যোতিস্মিতা, সাগর কিংবা পারিজাতরা সে খেলার কথা না জানবে কোনদিন, না শেখার অবকাশ পাবে। তাই লেখক বলেছেন -

“অবশ্য সে খেলা শেখার প্রশ্নই ওঠে না। আর তোমরা খেলতেও যেয়ো না যেন। হাত-পা ভাঙবে। অবশ্য খেলবেই বা কী করে। যে খেলায় খেলার সাথে ১০০ গাছ— সে কী তোমাদের খেলা হতে পারে? পারে না।”^৬

সেই খেলার নাম বলেছেন কথক ‘ঝুলঝুলি’। অনেকটা টার্জনের মতো খেলাটা, তবে ঝুলি ধরে নয়, একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে আর একটা গাছে চলে যাওয়া। চোখের পলকে এভাবে ঝুলতে ঝুলতে এক গাছ থেকে অন্য গাছে কোথায় যে চলে যেত মুঙ্গেরিলাল-তাক লেগে যেত লেখকের। সে এই ধরনের খেলা মন থেকে খেলে। তার সে খেলায় আছে এক অনাবিল আনন্দ। এমনই গ্রামীণ এই খেলাগুলো, যেমন- ব্যাঙ-ব্যাঙাচি, ঝুলঝুলি ইত্যাদি। সারাদেশ যেসব খেলা খেলে তাতে অনেক আড়ম্বর চাই। ফুটবল, ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড বা টেবল টেনিসের চেয়েও লেখকের এই জাতীয় দেশীয়, সারল্যময় খেলা বেশি পছন্দের। কারণ সামান্য জিনিস নিয়ে খেলা যায়। আজকের ছেলেমেয়েরা খেলা বলতে ভিডিও গেম, মুঠোফোনে নানা গেম কিংবা মাঠে হাজারও সাজ-সরঞ্জাম সহযোগে খেলাকে বোঝে। কিন্তু লেখক শিশুর সহজ, স্বাভাবিক রূপটিকে মনে করে মুঙ্গেরির সাধারণ জীবনযাপন ও লোককৌতুকে শিশু বিকাশের প্রথম ধাপ বলে মনে করেছেন। যেখানে আনন্দ, উৎকর্ষ ও কৌতূহলে ভরপুর একমনের পরিচয় মেলে শিশুদের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে গল্প লেখক বলেছিলেন –

“তোমরা খেলা বলতে বোঝ খেলার মাঠ। কিন্তু মাথার মধ্যেও একটা মাঠ আছে। মাথার মধ্যে এক খেলোয়াড় আছে, তার নাম মন। সে খেলে শুধু তার নিজের আনন্দে।”^৭

শিশুসাহিত্যের একটি অঙ্গ হিসেবে উঠে আসে পশুকথার নাম। জাতকের কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী-উপকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর এর নীতিনির্ভর গল্পকাহিনীতে পশু-পাখির কথা উঠে এসেছে। এই সমস্ত লেখাগুলি বরাবর শিশুদের উপভোগ্য হয়ে থাকে। এই রকমই একটি গল্প ‘অন্ধস্কুলে ঘণ্টা বাজবে কখন’ গল্পটি। এই গল্পের সূচনাতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন—

“আমার গল্প একটাই। আর সেটা নিয়েই আমি সব গল্প লিখি, যদিও সেই মূল গল্পটি নেহাতই শিশুপাঠ্য।”^৮

গল্পটি শুরু হচ্ছে একটি ইঁদুর ও হুলোবেড়ালের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। একদা একটি হুলো লম্বা লেজ এলিয়ে দিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছিল। সেই সময় একটি ইঁদুর এসে তাকে জাগায় এবং বলে তাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে। নিদ্রাতুর বিড়ালটি তাকে খেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করলে ইঁদুরটি তাকে বলে—

“বেশ না হয় পরে খাবে। এখন, অন্তত মেরে রাখো।”^৯

এই অনুনয় সত্ত্বেও বিড়ালটি পরে খাবে বলে জানায়। মৃত্যুকে অভিপ্রেত মনে করে ইঁদুরটি উদগ্রীব হয়ে পড়ে। কোনো না কোনো উপায়ে মরতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিড়াল তাকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক না হলে, সে জানায় রাস্তায় পড়ে থাকতে, কেউ না কেউ ঠিক মাড়িয়ে যাবে। অথচ ভাগ্যের পরিহাসে প্রত্যেকেই ডিঙিয়ে চলে যায়। কোনোভাবেই মৃত্যু আসে না ইঁদুরের। পুনরায় বিড়ালের কাছে গিয়ে হাজির হলে বিড়ালটি জানায়—

“আরে, অত অধৈর্য হও কেন? কেউ মাড়ায় কিনা দেখাই যাক না। নইলে, ইঁদুরের ঘণ্টা তো বাজল বলে।”^{১০}

অন্ধ স্কুলে ছুটির ঘণ্টা পড়লে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়বে এবং কোনো একজনের দ্বারা পদপিষ্ট হয়ে ইঁদুরটি মারা যাবে। মরতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। এই সময়টা কেউ নিজের ইচ্ছে খুশি মতো হাতের মুঠোয় নিয়ে নিতে পারে না। ধৈর্য ধরতে হবে প্রাকৃতিক নিয়মের অনিবার্যতার উপর এই বার্তাই যেন লেখক ইঁদুর-বিড়ালের আঙ্গিকে বোঝাতে চেয়েছেন। ইঁদুর-বিড়াল সহ অন্যান্য পশু-পাখি কেন্দ্রিক গল্পের দ্বারা ছোট্টরা সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত হয়। শিশুমন স্বভাবতই যেহেতু চঞ্চল এবং কল্পনাপ্রবণ, তাই এই জাতীয় পশুকথার মধ্যে তারা খুঁজে পায় কল্পনার এক আশ্চর্য জগৎ। এই কল্পনাপ্রবণতার মধ্যেও লেখক আপন স্বভাব প্রসূত কারণেই এহেন বাস্তবতার, দার্শনিকতার আলোকপাত করেছেন গল্পে।

‘বলাবাহুল্য’-গল্পটিও এমনই একটি পশুকথা নির্ভর গল্প। এখানেও একটি মশা এবং হাতিকে কেন্দ্র করে গল্পের বাহ্যিক কাহিনী বর্ণিত। একবার এক মশা গিল্লি ঠিক করে গোশাল ছেড়ে সে কিছুদিনের জন্য উঁচুতে কোথাও বাস করবে।

আর তাই মনে করে এক হাতির কানের মধ্যে বসবাস করার কথা স্থির করে। তার এই অভিলাষ হাতিকে ব্যক্ত করলে হাতি কিছুই সাড়া দেয় না। এক সপ্তাহ বাদে মশা গিল্মি তার পরিবার নিয়ে হাজির হয়ে হাতি মহাশয়কে বলে—

“মহাশয় আপনি যখন কিছু জানালেন না, ধরে নিচ্ছি, আপনার কোনও আপত্তি নেই।”^{১০}

এই বলে সে ও পরিবার হাতির কানে বসবাস করতে শুরু করে। তিন-চারদিন বাদে মশা গিল্মি বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। হাতির শরীরে শক্ত চামড়ার মোড়কে বাস করলেও সেখানে রক্তের জোগান পাওয়া যায় না। একফোঁটা রক্তের জন্য মানুষের পাতলা চামড়াই আদর্শ। আর ওই রক্তটুকু চুষে না নিতে পারলে মশার গর্ভসঞ্চর হয় না। তিনদিন অন্তর অন্তর ডিম পাড়তে হলে জলও চাই কিছুটা। তাই কয়েকদিন যেতেই মশা গিল্মি বুঝতে পারল এহেন বাতাস-বহুল বড়সড় ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থান তাদের আদৌ উপযুক্ত নয়। এই প্রসঙ্গে গল্পের শেষে মশা-হাতিকে জানায়—

“মহাশয়, আপনার কর্ণালয়টি রাজপ্রাসাদ বিশেষ হলেও আমাদের পক্ষে মোটেও সুবিধাজনক নয়। তাই আমি আমার পূর্বতন বাসা অন্ধকার ও মলমূত্রগন্ধী ষড় খুরনিকেতনেই আবারও ফিরে যাবার অনুমতি চাইছি।”^{১১}

অর্থাৎ লেখক এই কাল্পনিক পশুকথার দ্বারা আমাদের ছোটদের কোথাও না কোথাও নীতিশিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। মশা নিজের পরিচিত, অভ্যস্ত আশ্রয় ছেড়ে অন্য স্থানে যাওয়ার অভিলাষ করলেও সেখানে গিয়ে সুখী হতে পারেনি। ছোটদের উদ্দেশ্যে বলতে চেয়েছেন নিজের যা কিছু আছে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া দরকার। সেটা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ হলেও তা নিজের একথা মানুষ ভুলে যায়। বাইরের চাকচিক্যের দিতে হাত বাড়ায়। কিন্তু সেখানে মানিয়ে নিতে পারে না। তাই গল্পের শেষে মশাও পুনরায় ফিরে এসেছে নিজ বাসস্থানে। আর এখানেই আমাদের মনে পড়ে যায় রজনীকান্ত সেনের বিখ্যাত কবিতাটি—

“বাবুই হাসিয়া কহে, ‘সন্দেহ কি তাই?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই, পরেরও বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।”

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সে একা’ গল্পটি একটি ভৌতিক ছোটগল্প। তবে এই গল্পটিকে ভৌতিক কিশোর সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। এই শ্রেণীর গল্পে ভয়, রহস্য ও রোমাঞ্চের মিশেল দেখা যায়। গা ছমছমে পরিবেশ ও রহস্যের উপাদান পাঠকদের আকৃষ্ট করে। তবু শুধু একতরফা ভয় নয়, অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যকরভাবেও উপস্থাপন করা হয়। তবে শিশু-কিশোরদের কল্পনার জগতকে প্রসারিত করতে সাহায্য করা এবং ভয়কে জয় করার মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যই মূলত এই জাতীয় সাহিত্য রচনা করা হয়। আলোচ্য ‘সে একা’ - গল্পটিও এই ধরনের একটি ছোটগল্প। গল্পের শুরুতেই কথক বলেছেন এই গল্পটি নিজেই একটি ভয় ও বিপজ্জনক গল্প। গল্পটি যে পড়বে বা শুনবে সেই ভীষণ বিপদে পড়বে। কারণ ভূতের ভয়ে যে উত্তেজনা, ভীতি তৈরি হয় তা মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন -

“বিপদে পড়ে যাবে বলতে, পড়ে যাবে হাড়-হিম করা সেই ভয়ের মধ্যে যা তোমাকে ‘ও মাগো বা ওগো বাবাগো’ বলে চিৎকার করে উঠতে বাধ্য করবে। হ্যাঁ, ভূতের গল্পই আমি বলতে যাচ্ছি। ... সত্যি ভূত। ... আমি ভূতের সঙ্গে কথা বলছি। ... ভূতের সঙ্গে আমি গাড়ি চেপেছি। ভূতকে আমি ছুঁয়ে দেখেছি।”^{১২}

এই ভূত বিষয়ক গল্পের কথা বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন, একসময় প্রায় প্রতি বছরই তারা সপরিবারে পূজার ছুটিতে শ্যামপাহাড়ি নামে একটা গ্রাম্য জায়গায় বেড়াতে যেতেন। জায়গাটি বাংলা-বিহার সীমান্তে দুমকা রোডের ওপর একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। প্রায় প্রতিবছর পূজাতে গেলেও শেষ তিনবছর হল আসতে পারেননি। সেবার গিয়ে অন্যান্যব্যবহারের মতোই মুকুন্দ স্মৃতিভবনের গেস্ট হাউসে থাকেন। একদিন মাঠের মধ্যে জিপ নিয়ে লেখকদের সাথে দেখা করতে আসেন সাহেবগঞ্জের এস. ডি ও লোকেশনারায়ণ মিশ্র। সাহেবগঞ্জে বেড়াতে যাবার সময় থেকে তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল লেখকের। আর কদিনের মধ্যেই বন্ধুত্ব, ফোনে যোগাযোগ থেকে যায়। লেখক জানতে পেরেছিলেন লোকেশ পরবর্তীকালে সান্তাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার হয়। এইবারও বেড়াতে এসে লেখকের সাথে হট করে দেখা হলে, খুব জোরাজুরি করে তার বাংলায় যাওয়ার জন্য। শেষমেশ না পেরে স্ত্রী ও কন্যা যেতে রাজী না হওয়ায়, তিনি বাধ্য হন সঙ্গে

যেতে। এই গল্পের সূত্রধরেই শুরু হয় চতুরের গল্প। এই গল্পের নায়কই চতুর। সে একজন ভূত। আর যখনই কেউ তার গল্প বলে সে সেখানে চলে আসে। লেখক একবার ক্যালিফোর্নিয়ার সানহোসে শহরে তার দুই ভাইপোকে এই গল্প শুনিয়েছিল। ওই দূর দেশেও চতুর পাড়ি দিয়েছিল গল্পটি শুনতে।

লেখক যে বাচ্চাদের এই গল্প বলতে শুরু করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন শুভব্রত। লেখক বলেন গল্প শুরু করার আগে দরজা বন্ধ করে দিতে। সবাইকে কাছে এগিয়ে ঘেমাঘেষি করে বসতে। যাতে চতুর এলেও কোনো অসুবিধা বা ভয় না জন্মায় তাদের মনে। এই প্রসঙ্গে ছোটদের ভয় ভাঙাতে চতুর সম্পর্কে আরও বলেন—

“চতুরও তোমাদের মতো একটা বাচ্চা ছেলে কিনা। আর সে-ও ঠিক তোমাদের মতো ভূতের গল্প শুনতে কী যে ভালোবাসে! হোক না সে গল্প তার নিজের, তবু। গল্পের আসরে সে স্বয়ং হাজির হবেই।”^{১০}

গল্পের কথায় ফিরে এসে লেখক বলতে শুরু করেন— লোকেশের সাথে যাত্রাপথে গাড়িতে বসে কেমন যেন তাকে অচেনা বোধ হচ্ছিল। তাকে নানা প্রশ্ন করলে অসংলগ্ন উত্তর দেয়। তার চেহারাও কেমন অচেনা মনে হয়। হঠাৎই গাড়ির পেছনের সিটে একবার যেন একটা ন্যাড়া মাথা বাচ্চা বিহারি ছেলেকে বসে থাকতে দেখেন। মাথায় তার মস্ত টিকি। পরে আর তাকে দেখা যায়নি। লেখক সেটাকে নিজের চোখের ভুল মনে করেন। এরপর লোকেশ্বর তার বাংলোতে এসে পৌঁছালে দেখতে পান পাচিল ঘেরা একটি প্রকাণ্ড কম্পাউন্ডের মাঝে লোকেশের বাংলো। প্রায় সব ঘরেই তালাবন্ধ, দুটি ঘর নিয়ে লোকেশ থাকে। এরপর সন্ধ্যা নেমে এলে, ছাদের দিকে দৌড়োদৌড়ির শব্দ হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু লেখক তাতে ভয় পাননি কারণ লোকেশ বলেছিল একটি কাজের ছেলে আসতে পারে, কাজ করে দিয়ে চলে যাবে। রাতে ফিরে এসে গল্প হবে তাদের। তবে লোকেশের অবর্তমানে ছাদে দুপদাপ শব্দ পেয়ে লেখক দেখতে গেলে দেখেন ছাদের দরজায় একাধিক খিল মারা, প্রত্যেকটি নাটবল্টু দিয়ে সাঁটা। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই রান্না ঘরে মিটমিটে আলোতে ফতুয়া পরা বাচ্চা ছেলেকে মাথা ঝুকিয়ে রান্না ঘরে বটিতে কিছু কুটতে দেখা যায়। তারও মাথা ন্যাড়া, মস্ত ঘাড় পর্যন্ত টিকি, গলায় পৈতে। লেখক নিশ্চিত হলেন এই সেই চতুর। কিন্তু তাকে ডাকলে, প্রশ্ন করলেও সে সাড়া দেয় না। মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়। রাত বাড়তে থাকলে লেখক বিশেষ সুবিধা বোধ না করায় রাত ১২টায় শেষ দুমকা থেকে রামপুরহাটের বাস ধরে বাড়ি ফিরে আসেন। পরে যামিনীবাবুর কাছে জানতে পারেন লোকেশ দু-বছর আগেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে, সাথে তার একটি ছোট ছেলেও ছিল চতুর। লেখকের অভিজ্ঞতার কথা শুনে অতিথিশালার যামিনীবাবু বলেন –

“করেছেন কী। সাঁওতাল পরগণার ডি.সি; কী নাম বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এল এন মিশরা- ওঁর জিপ তো লাঙলভাঙার কাছে খাদে পড়ে গিয়েছিল। এতো দু-বছর আগের ঘটনা। ...সঙ্গে ছিল ওই ছেলেটা- চতুরানন ত্রিবেদী। দুজনেই স্পট ডেড।”^{১১}

ছোটদের রচনামূলক মন ও মনন গঠনে এজাতীয় রচনাগুলি সত্যিই সন্দীপনের কাছে আশাতীত। তবে তিনি তাঁর রচনায় ছোটদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। ছোটদের নির্মল মজা ও আনন্দের পাশাপাশি তাদের মনের উপযুক্ত বিকাশের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের। নাগরিক লেখক হয়ে চিরাচরিত শিশুমনের সারল্যকে খুব দক্ষতার সাথে তাঁর গল্পগুলির মধ্যে তুলে ধরেছেন সন্দীপন। খুব সচেতনভাবে ছোটদের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য হয়তো তাঁর ছিল না, কিন্তু তাঁর বেশ কিছু রচনায় ছোটদের সাহিত্যের স্থান লক্ষ করা যায়। বড়দের সমাজে ছোটদের ভূমিকাও যে কিছু কম নয়, তাদের মানসিক চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, রাগ-অভিমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব, কৌতূহল প্রবণতা স্থান পেয়েছে সন্দীপনের গুটিকতক ছোটগল্পে। নীতিশিক্ষা, উপদেশ, শিশুর সারল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের শিশু-কিশোর সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আলোচ্য গল্পগুলির প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় শিশুমনের প্রকাশ ঘটাতে এক শিশুসাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর প্রতিভার এ-এক স্বতন্ত্র সংযোজন।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘সাহিত্যে ছোটগল্প’, মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ-শ্রাবণ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩

-
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩১৪, পৃ. ৩
 ৩. Lukens, Rebecca J., 'Critical Handbook of Children's Literature about readers', 1976, page-3
 ৪. চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন, 'গল্পসমগ্র' (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী-২০১৯, পৃ. ১৯৯
 ৫. তদেব, পৃ. ২০০
 ৬. তদেব, পৃ. ২০০
 ৭. তদেব, পৃ. ১৯৩
 ৮. তদেব, পৃ. ১৯৩
 ৯. তদেব, পৃ. ১৯৩
 ১০. তদেব, পৃ. ১৯৮
 ১১. তদেব, পৃ. ১৯৮
 ১২. তদেব, পৃ. ১৯৪
 ১৩. তদেব, পৃ. ১৯৪
 ১৪. তদেব, পৃ. ১৯৭